হালাল খাদ্য ও ই- কোড সম্পর্কিত শরঈ বিধান

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

হে মানবসকল! তোমরা পৃথিবীর হালাল ও উত্তম খাবার ভক্ষণ করো। [সূরা বাকারা; ১৬৮]

হাদীসে পাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ

অর্থ : এমন দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা হারাম আহার্য দ্বারা গঠিত হয়েছে। [মুসনাদে বাযযার; হাদীস নং ৪৩, আল মু'জামুল আওসাত; হাদীস নং ৫৯৬১]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, একজন মুমীন- মুসলমান তার খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে চতুষ্পদ জন্তুর মত নয় যে, কোন ধরণের বাছ- বিচার ছাড়াই যা ভালো লাগবে, তাই সে খাবে। বরং তার জন্য এ বিষয়ে সচেতনতা আবশ্যক যে, তার শরীরে যেন কোনো হারাম খানা প্রবেশ না করে।

খাদ্যদ্রব্য হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যপারে ইসলামী শরী'আতে সুনির্দিষ্ট কিছু মূলনীতি আছে। আমাদের বাজারজাত পণ্যের হালাল ও হারাম নির্ধারণের আগে সে সকল মূলনীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক।

প্রথম মূলনীতি:

الأصل في الحيوان الحل والأصل في اللحوم التحريم

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোনো জীবিত প্রাণির ব্যাপারে মূল হুকুম হলো যে, তা হালাল। অর্থাৎ কোনো জীবিত প্রাণির হালাল কিংবা হারাম কোনো একটি হুকুমের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো দলীল পাওয়া না গেলে মূল হুকুমের ভিত্তিতে উক্ত প্রাণিকে হালাল মনে করা হবে এবং শরঈ পদ্ধতিতে জবাই করে কিংবা [শিকারী প্রাণি হলে] শরঈ পদ্ধতিতে শিকার করে তা খাওয়া বৈধ হবে।

এর বিপরীতে প্রাণির গোশতের মধ্যে এবং মৃত প্রাণির মধ্যে মূল হুকুম হলো যে তা হারাম। অর্থাৎ কোনো মৃত প্রাণির ব্যাপারে কিংবা গোশতের ব্যাপারে যদি সন্দেহ হয় যে এ গোশত শরঈ পদ্ধতিতে জবাই করা হয়েছে, নাকি তা মৃত জানোয়ারের গোশত?- এরূপ সন্দেহের ক্ষেত্রে মূল হুকুমের ভিত্তিতে উক্ত গোশতকে হারাম মনে করা হবে এবং তা খাওয়া বৈধ হবে না।

الموسوعة الفقهية (/ :

"ما يتأتى أكله من الحيوان يصعب حصره، والأصل في الجميع الحل في الجملة إلا ما استثني فيما يلي:

الأول الخنزير ,,,.واختلفوا فيما عداه من الحيوان: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يحل أكل كل ذي ناب من السباع: ,,, ولا ذي مخلب من الطير الثاني: ما أمر بقتله كالحية، والعقرب، والفأرة، وكل سبع ضارٍ كالأسد، والذئب، وغيرهما مما سبق. الثالث: المستخبثات: فإن من الأصول المعتبرة في التحليل والتحريم: الاستطابة، والاستخباث. والأصل في ذلك قوله تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث) . وقوله تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) "انتهى من الموسوعة

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الأصل في اللحوم هو الحل أو التحريم؟ فأجاب: الأصل في اللحوم التحريم لا في الحيوان، الأصل في الحيوان الحل ، والأصل في اللحوم التحريم حتى نعلم أو يغلب على ظننا أنها مباحة...."انتهى من لقاء الباب المفتوح (/ . (والله أعلم).

উল্লেখ্য, গোশতের ক্ষেত্রে মূল হুকুম হারাম হওয়া মতটির ব্যাপারে চার মাযহাবের ইমামগণ ঐক্যমত ব্যক্ত করেছেন। [হানাফী মাযহাব, হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন; ৬/৪৯২, মালেকী মাযহাব, ইবনুল আরবী, আহকামুল কুরআন;

২/৩৫, শাফেয়ী মাযহাব, ইমাম নববী, শরহু সহীহিল মুসলিম; ১৩/১১৬, হাম্বলী মাযহাব, ইবনে কুদামা, আল মুগনী; ১৩/১৮]

হালাল ও হারাম প্রাণির প্রকারভেদ-

শরঈ দলীল- প্রমাণের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবে জলজ ও স্থলজ প্রাণি হালাল ও হারাম হওয়ার বিষয়টিকে ফুকাহায়ে কেরাম কয়েকভাগে ভাগ করেছেন-

জলজ প্রাণিঃ

মাছ ছাড়া অন্য সকল জলজ প্রাণি হারাম। কেননা, জলজ প্রাণির মধ্যে কেবল মাছ ছাড়া অন্যান্য প্রাণিকে বিভিন্ন দলীল- প্রমাণের আলোকে শরী'আতে হারাম করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মাছ ছাড়া অন্যান্য জলজ প্রাণি খাওয়া হারাম হলেও তা নাপাক নয়। কেননা, পানিতে বাসকারী প্রাণির মধ্যে রক্ত থাকে না। আর যে সকল প্রাণির শরীরে রক্ত নাই, সেগুলো মরলে নাপাক নয়। কাজেই কাকড়া যে তেলে ভাজা হয়েছে, সে তেলে যদি মাছ ভাজা হয় (এবং তাতে কাকড়ার কোনো অংশ না থাকে) তবে তা খাওয়া জায়িয হবে।

স্থলজ প্রাণিঃ

- স্থলজ প্রাণির মধ্যে যে সকল প্রাণির শরীরে রক্ত নেই, তা খাওয়া জায়িয নয় যেমন মশা, মাছি। তবে টিড্ডি ব্যতিত। কেননা, টিড্ডি হালাল হওয়ার বিষয়টি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।
- আর যে সকল স্থলজ প্রাণির শরীরে রক্ত আছে, কিন্তু প্রবাহমান নয়, তা খাওয়াও বৈধ নয়। যেমন: টিকটিকি।
- যে সকল স্থলজ প্রাণির দেহে প্রবাহমান রক্ত আছে, সেগুলো যদি অধিকাংশ সময় তৃণভোজি হয়, তবে সে সকল প্রাণি হালাল। চাই তা গৃহপালিত হোক বা বন্য জন্তু হোক। যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, বকরী, দুম্বা, খরগোশ, বন্য গরু, বন্য গাধা, বন্য উট ইত্যাদি।

তবে এ সকল হালাল প্রাণির 'গোশতের' মধ্যে মূল শরঈ বিধান যেহেতু হারাম হওয়া, কাজেই যতক্ষণ না শরঈ পদ্ধতিতে জবাই/শিকার করা হবে, ততক্ষণ তা খাওয়া জায়িয হবে না।

উল্লেখ্য, শরী'আতের দৃষ্টিতে জবাই সহীহ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্ত কয়েকটি-

১. আল্লাহর নামে 'বিসমিল্লাহ' বলে জবাই করতে হবে।

২. ধারালো অস্ত্রের মাধ্যমে খাদ্যনালী, শ্বাসনালী এবং দুই রক্তনালী- এ চার প্রকারের যে কোনো তিনটি কাটতে হবে।

৩. জবাইকারী প্রাপ্তবয়স্ক, বুঝসম্পন্ন এবং মুসলমান বা আহলে কিতাব হতে হবে।

উল্লেখ্য, আহলে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করে এবং প্রকৃত খ্রিষ্টধর্ম বা ইয়াহুদী ধর্মের মৌলিক আকীদায় বিশ্বাস করে এমন ব্যক্তি। বর্তমান বিশেষ বাস্তবতা হলো যে, যারা নিজেদেরকে খ্রিষ্টান বা ইয়াহুদী দাবী করে থাকে, তাদের অধিকাংশই নাস্তিক! অর্থাৎ তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। আর খ্রিস্টান ধর্ম বা ইয়াহুদী ধর্মের সাথেও তাদের আদৌ কেনো বন্ধন নেই। কাজেই নামকাওয়াস্তে এ সকল খ্রিষ্টান বা ইয়াহুদীদেরকে আহলে কিতাব মনে করে তাদের জবাইকৃত গোশত খাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। [মুফতী ত্বকী উসমানী দা.বা. রচিত 'বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসারাহ' গ্রন্থের أَحْكَامُ الذَّبَائِحِ وَاللُّحُومُ الْمُسْتَوْرَدَةُ প্রবন্ধ]

- আর যে সকল প্রাণি দাঁত দ্বারা কিংবা নখ দ্বারা শিকার করে খায়, তা খাওয়া জায়িয নয়। চাই তা গৃহপালিত হোক বা বন্য জন্তু হোক। যেমন, কুকুর, বিড়াল, বাঘ, সিংহ, নেকড়ে, বন বিড়াল, শিয়াল ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণি। একই কথা পাখির ক্ষেত্রে যে, পাঞ্জা দ্বারা শিকার করে খায়, তা হারাম। যেমন, শকুন, বাজপাখি। আর যা অধিকাংশ সময় তৃণভোজি, তা হালাল।

- যে সকল প্রাণি অধিকাংশ সময় হারাম বস্তু ভক্ষণ করে, কিংবা নাপাক বস্তু খায়, সে সকল প্রাণি খাওয়াও জায়িয নয়। যেহেতু তাতে হারামের মিশ্রণ আছে। যেমন, কাক, যা নাপাক- আবর্জনা খায়। [হালাল ও হারাম প্রাণির প্রকারভেদের ব্যাপারে বিস্তারিত দেখনু 'আল মাওসূআতুল ফিকিহয়্যাতুল কুওয়াতিয়্যাহ; ৫/১২৪]

একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা : বিদেশ থেকে আমদানীকৃত গোশতের হুকুম

এ বিষয়ে একটি মূলনীতি হলো যে, "মুসলিম দেশ থেকে আমাদানীকৃত হালাল প্রাণির গোশত মুসলমানদের প্রতি সুধারণাবশত হালাল মনে করা হবে। অর্থাৎ ধরে নেওয়া হবে যে, এ প্রাণিটি কোনো মুসলমান জবাই করেছে এবং হালাল পদ্ধতিতে জবাই করা হয়েছে। এর বিপরীতে যদি অমুসলিম দেশের গোশত হয়, তবে সাধারণ ধারণামতে সে গোশত হালাল হবে না। কেননা, অমুসলিমদের জবাইকৃত গোশত হালাল নয়।"

ফুকাহায়ে কেরাম যদিও উপরিউক্ত মূলনীতি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বর্তমানে বাস্তবতা হলো, আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক চাহিদার কারণে স্বল্প সময়ে অধিক পরিমাণ প্রাণি জবাই করার নিমিত্তে রপ্তানীকারক মুসলিম/অমুসলিম সব দেশেই তৈরি হয়েছে Slaughter House বা কসাইখানা। যেখানে প্রাণি জবাইয়ের পত্যক্ষ কর্মে কোনো মানুষের সহযোগিতা ছাড়াই আধুনিক পদ্ধতিতে মেশিনের সাহায্যে এক মূহুর্তেই হাজার হাজার প্রাণি জবাই করা হয়। কিন্তু আপত্তির বিষয় হলো, এ সকল কসাইখানায় সাধারণত জবাই সহীহ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শরঈ শর্তসমূহ লক্ষণীয় থাকে না। কেননা,

১. বেশিরভাগ কসাইখানায় বিসমিল্লাহ সহকারে একজন মুসলমান/আহলে কিতাব কর্তৃক প্রত্যক্ষ জবাই সম্পাদন করা হয় না; বরং একইসাথে হাজারো মুরগী জবাই হতে থাকে, আর বেশির চেয়ে বেশি একজন মুসলমান দাড়িয়ে দাড়িয়ে বিসমিল্লাহ বলতে থাকে। অথচ প্রাণি হালাল হওয়ার জন্য প্রতিটি প্রাণিকে জবাইকালে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিসমিল্লাহ বলা শর্ত।

২. অনেক কসাইখানায় মুরগীকে জবাই করার আগে ইলেক্ট্রিক তাপ সমন্বিত বরফ শীতল পানিতে ডুবানো হয়। বিশেষজ্ঞদের মত হলো যে, এই ঠান্ডা পানিতে ৯০ পার্সেন্ট মুরগীর হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়!

৩. মেশিনে তড়িৎ জবাইকালে প্রাণি হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে যে শীরাগুলো কাটা আবশ্যক, অনেক মুরগীর ক্ষেত্রেই তা যথাযথ হয় না।

৪. অমুসলিম দেশ থেকে আগত গোশতের ব্যাপারে এ সুধারণা করা সম্ভব নয় যে, কোনো মুসলমানই বিসমিল্লাহ বলে জবাই করেছে।

৫. বড় প্রাণি যেমন গরু, মহিষ ইত্যাদি জবাই করার ক্ষেত্রে আধুনিক কসাইখানাগুলোতে প্রথমে জানোয়ারকে নিষ্ক্রিয় করা হয়। নিষ্ক্রিয়করণের অনেক পদ্ধতি রয়েছে। মুসলিম বিশেষজ্ঞদের প্রত্যক্ষ বর্ণনামতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় করার সময়ই জানোয়ার মারা যায়! সেক্ষেত্রে হাতে জবাই করলেও তা হালাল হবে না!

সারকথা, বহির্বিশ্বের মুসলিম/অমুসলিম দেশ থেকে আমদানীকৃত যে কোনো গোশতের মধ্যে উপরিউক্ত সমস্যাগুলো থাকা খুবই স্বাভাবিক। কাজেই ভোক্তা সাধারণের লক্ষণীয় হলো, আমদানীকৃত গোশত ক্রয়ের সময় যদি তা মুসলিম দেশের হয় এবং হাতে জবাইকৃত লেখা থাকে, তবে তা হালাল হবে। যদি মেশিন জবাইকৃত লেখা থাকে, তবে হারাম। যদি জবাই পদ্ধতি লেখা না থাকে, শুধু হালাল লেখা থাকে এবং তা কোনো নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সত্যয়ন সম্বলিত হয়, তবে তা খাওয়াও জায়িয হবে।

আর অমুসলিম দেশের গোশতের ক্ষেত্রে কেবল নির্ভরযোগ্য কোনো মুসলিম সংগঠনের 'হালাল' সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ক্রয় করা যাবে। [আমদানীকৃত গোশতের হুকুমের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. মুফতী ত্বকী উসমানী দা.বা. রচিত 'বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসারাহ' গ্রন্থের أَحْكَامُ الذَّبَائِحِ وَاللُّحُومُ الْمُسْتَوْرَدَةُ প্রবন্ধ।]

দ্বিতীয় মূলনীতি :

সাধারণ খাদ্যপণ্যের মধ্যে মূল শরঈ বিধান হলো 'হালাল হওয়া'। অর্থাৎ খাদ্যপণ্য হালাল মনে করা হবে, যতক্ষণ না তাতে হারাম হওয়ার কোনো কারণ পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে কারীম মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

অর্থ : তিনিই (আল্লাহ) সেই সত্ত্বা, যিনি পৃথিবীর সকল কিছু তোমাদের (উপকারের) জন্য সৃষ্টি করেছেন। [সূরা বাকারা; ২৯]

উল্লিখিত আয়াতের কারণে ফুকাহায়ে কেরামের মত হলো, পৃথিবীতে মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্ট সব কিছু মানুষের জন্য বৈধ। এ আয়াতের আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম নিম্নোক্ত মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন-

أصل الاشياء الإباحة

(মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্ট) সকল বস্তুর ব্যাপারে শরী'আতের প্রথম বিধান হলো যে, তা বৈধ।

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ আল্লামা ইবনে আবিদীন রহ. 'ফাতাওয়ায়ে শামী' গ্রন্থে বলেন,

مطلب المختار أن الأصل في الأشياء الإباحة:

أقول: وصرح في التحرير بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية اهـ

কাজেই এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, খাদ্যপণ্যও মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্ট। কাজেই প্রাণি (জীবিত) এবং অন্যান্য খাদ্যপণ্য শরী'আতের দৃষ্টিতে মৌলিকভাবে হালাল। কাজেই কোনো প্রাণি বা অন্যান্য খাদ্যপণ্য হারাম হওয়ার জন্য শরী'আতের ভিন্ন দলীল আবশ্যক হবে।

আমাদের বাজারজাত পণ্য কি হালাল নাকি হারাম?

আমাদের বাজারে যে সকল খাদ্যপণ্য পাওয়া যায়, উৎসের ভিত্তিতে সেগুলোর উপকরণকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

১. প্রাণি থেকে আহরিত উপকরণ।

২. কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থের উপকরণ।

৩. উদ্ভিদ থেকে আহরিত উপকরণ।

৪. অ্যালকোহল থেকে আহরিত উপকরণ।

৫. মিক্স ফুড বা প্রসেস ফুড, যা প্রাণি কিংবা অ্যালকোহলের মিশ্রণে তৈরি করা হয়।

উপরোল্লিখিত প্রথম মূলনীতির আলোকে প্রাণি থেকে আহরিত উপকরনের ব্যাপারে শরঈ বিধান হলো, যে প্রাণি থেকে আহরণ করা হয়েছে, যদি তা হারাম প্রাণি হয়, অথবা হালাল প্রাণি কিন্তু (মাছ ও টিড্ডি ব্যতিত) শরঈ পদ্ধতিতে জবাই করা হয়নি, তবে এ জাতীয় প্রাণি থেকে আহরিত উপকরণও হারাম হবে।

উপরোল্লিখিত দ্বিতীয় মূলনীতির রাসায়নিক পদার্থ ও উদ্ভিজ উপকরনের বিধান হলো যে, সম্পূর্ণ হালাল, যদি তাতে নাপাকীর মিশ্রণ না থাকে এবং কোনো উপায়ে তা মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ও নেশার কারণ না হয়। - [সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরো উদ্ধৃতির জন্য প্রবন্ধের শেষে সংযুক্ত পরিশিষ্ট - ৩ দ্র.]

আর চতুর্থ প্রকার খাবারের ব্যাপারে শরী'আতের হুকুম হলো, যে অ্যালকোহল আঙ্গুরের কাঁচা রস, কিংবা খেজুরের রস দ্বারা তৈরি করা হয়, তা নাপাক। যদ্দরুন তা খাওয়াও হারাম। কেননা, তা নাপাক এবং তাতে খাদ্যপণ্য হারাম

হওয়ার অন্যতম কারণ নেশাযুক্ত হওয়া Intoxication পাওয়া যায়। যেমন মদ। আর যদি আঙ্গুর কিংবা খেজুর দ্বারা তৈরিকৃত না হয়, তবে তা নাপাক নয় এবং নেশা না হলে প্রয়োজনে তা খাওয়া এবং ব্যবহার করা জায়িয হবে।

মিক্সড ফুড বা প্রসেস্ড ফুড

আমাদের বাজারে এমন অনেক খাবার পাওয়া যায়, যা প্রাণি, কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ, উদ্ভিদ, অ্যালকোহল- এ চার প্রকার উৎসের কোনো একটি থেকে এককভাবে তৈরি করা হয় না; বরং তা একাধিক উৎসের উপকরণ সমৃদ্ধ হয়। আলোচ্য শিরোনামে 'মিক্সড ফুড বা প্রসেস ফুড' দ্বারা এমন খাবারই উদ্দেশ্য। ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ ইং তারিখে 'খাদ্য সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা ২০১৭' শিরোনামে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের বর্ণনামতে 'খাদ্য সংযোজন দ্রব্য' অর্থ বিশেষ উদ্দেশ্যে খাদ্যের সহিত সংযোজিত কোন বস্তু, যাহা সাধারণত মূল আহার্য হিসাবে ভক্ষণ করা হয় না, তবে বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদান হিসাবে কারিগরি প্রয়োজনে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ, মোড়কজাতকরণ বা সংরক্ষণের নিমিত্তে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রত্যাশিত উপযোগিতা প্রাপ্তির জন্য, খাদ্যে ব্যবহৃত হয় এবং দূষক বা অন্য কোন মিশ্রিত পদার্থের অন্তর্ভূক্তি ব্যতিরেকেই খাদ্যের গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য মূল খাদ্যের বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে।

এ সকল খাদ্য উপকরণের 'উৎস' প্রাণি, কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ, উদ্ভিদ ও অ্যালকোহল- এ চার প্রকার উৎসের কোনো একটি কিংবা একাধিক হয়ে থাকে। কাজেই কোনো খাদ্যপণ্যকে হালাল বা হারাম বলতে হলে সংযোজিত উপকরণের ভিত্তিতে নয়; বরং উপকরণের 'উৎসে'র ভিত্তিতে বলতে হবে।

মিক্সড ফুডের বিধান জানার আগে একটি মূলনীতি জানা আবশ্যক। আর তা হালো- যখন হালাল খাদ্যবস্তুর মধ্যে হারাম বস্তু মিশ্রিত হবে, তখন তার হুকুম কী হবে? যেহেতু হারাম বস্তুর কারণ ভিন্ন হওয়ায় তার মিশ্রণের হুকুমও পরিবর্তন হবে, কাজেই ঐ সকল মূলনীতির আলোচনাও অপরিহার্য, যেগুলোর কারণে শরী'আতে কোনো খাদ্যপণ্য হারাম করা হয়-

খাদ্যপণ্য হারাম হওয়ার শরঈ মূলনীতি

১. مضر للصحة [Harmful] অর্থাৎ মানবস্বাস্থের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হওয়া

অর্থাৎ কোন জিনিস তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষের দ্বীনের জন্য কিংবা জ্ঞান ও মস্তিষ্কের জন্য, অথবা জানের জন্য কিংবা মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হওয়ার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে জানা যাবে, তখন তা হারাম হবে। যেমন বিষ, যা মানুষের জানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, চাই তা কোনো প্রাণি থেকে আহরিত হোক বা কোনো বিষাক্ত উদ্ভিদ থেকে হোক। আরো উদাহারণ যেমন মাটি, বালি, পাথর, ছাই ইত্যাদি। যা বিষ তো নয়, কিন্তু শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হওয়ায় হারাম।

উল্লেখ্য, কোন বস্তুটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর, আর কোনটি ক্ষতিকর নয়- তা নির্ধারিত হবে ডাক্তার ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বক্তব্য দ্বারা।

২. السكر। [Intoxication] অর্থাৎ নেশাযুক্ত হওয়া

নেশাগ্রস্ত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষের মস্তিষ্ক এবং ইন্দ্রিয়শক্তি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়া।

৩. استخباث। [Filthins] অর্থাৎ সৃষ্টিগত সুস্থরুচিবোধ কর্তৃক ঘৃণিত হওয়া।

'ঘৃণিত' হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, একজন সৃষ্টিগতভাবে সুস্থরুচী সম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে কোনো বস্তুর আহার করা ঘৃণিত হওয়া। যেমন পোঁকামাকড়, কীটপতঙ্গ, হিংস্র জন্তু- জানোয়ার।

৪. النجس। [Esimpurity] অর্থাৎ নাপাক হওয়া।

চাই তার মৌলিকত্বই নাপাক হোক যেমন, রক্ত। অথবা বস্তুটি মূলত পাক কিন্তু তাতে কোনো নাপাকী মিশ্রণে তা নাপাক হয়েছে- এমন হোক, যেমন, তরল ঘি, যাতে ইদুর পড়ে মারা যায়।

৫. كرامت [Human Dignity] অর্থাৎ মানবীয় সম্মানের অধিকারী হওয়া।

কারামাত দ্বারা উদ্দেশ্য কোনো বস্তু মানবীয় সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া। মহান আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষকে সর্বাধিক সম্মানিত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে মানবদেহের কোনো অংশ খাওয়া কিংবা কোনো হালাল খাদ্য বস্তুতে মিশ্রণ করা এবং তা খাওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম।

হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন, [দ্র. বেহেশতি যেওর; ৯/৯৮ মীর কুতুবখানা]

جاننا چاہیے کہ شریعت مطہرہ میں استعمال کے منع ہونے کی وجہیں چار ہیں: نجاست،،،،،،مضر ہونا،استخباث یعنی طبیعت سلیمہ کا اس سے گھن کرنا، جیسے کیڑے مکوڑے میں ،اور نشہ لانا

কোনো জিনিস যখন স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর হবে, তখন তা নাপাক হওয়া কোনো আবশ্যক নয়। যেমন বিষ, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর, কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, সব বিষয়ই নাপাক হবে। তেমনি যে জিনিস নাপাক হবে, তা নেশাযুক্ত হওয়া কোনো আবশ্যক নয়। তেমনি যে জিনিস সম্মানিত হবে, তা ক্ষতিকর কিংবা নাপাক হওয়াও আবশ্যক নয়। অর্থাৎ যে কোনো বস্তু হারাম হওয়ার জন্য একাধিক কারণ যেমন থাকতে পারে, তেমনি এককভাবে কোনো একটি কারণও থাকতে পারে।

[খাদ্যপণ্য হারাম হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখুন বাদায়িয়ূস সানায়ে; ১৮৬, হিন্দিয়া; ৫/৩৪, ওয়াহবাহ যুহাইলি, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু; ৪/২৫৯৪, আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহতুল কুওয়াইতিয়্যাহ; ৫/১২৫]

মিক্সড ফুডের শরঈ হুকুম

হারাম বস্তুর হারাম হওয়ার কারণ হিসেবে মিশ্রণের পর হালাল বস্তুর হুকুম নিম্নরূপ হবে- [সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত দলীলের জন্য পরিশিষ্ট- ৫ দ্র.]

১. যদি মিশ্রিত বস্তু হারাম হওয়ার কারণ 'ক্ষতিকর হওয়া [Harmful] হয়, উক্ত বস্তু যদি কোনো হালাল বস্তুর মধ্যে মিশ্রণ করা হয়, তবে তার 'ক্ষতিকর দিক যদি পূর্ববৎ বহাল থাকে, তবে উক্ত হালাল বস্তুও হারাম হয়ে যাবে। আর যদি মিশ্রণের কারণে তার ক্ষতি দূর হয়ে যায় তবে উক্ত হালাল বস্তু খাওয়া জায়িয।

এ ব্যপারে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, [বেহেশতি যেওর; ৯/৯৮]

اگر مضر چیز کا نقصان کسی طرح جاتا رہے یا منشی میں نشہ نہ رہے تو ممانعت بھی نہ رہیگی

এর উদাহরণ হলো যেমন বিষ, চাই তা প্রাণি থেকে হোক বা উদ্ভিদ থেকে। বিষ যেহেতু মানব শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, কাজেই তা হারাম। এখন যদি বিষ কোনো ঔষধের সাথে মিলানো হয় এবং তার ক্ষতিকর প্রভাব অবশিষ্ট না থাকে বরং ঔষধের জন্য উপকারী হয়, তবে তা খাওয়া হারাম হবে না।

২. যদি মিশ্রিত বস্তু হারাম হওয়ার কারণ কারামাত হয় অর্থাৎ মানব শরীরের কোনো অংশ যদি কোনো হালাল বস্তুর মধ্যে মিশ্রণ করা হয়, তবে উক্ত মিশ্রণ অল্প হোক কিংবা বেশি হোক- উক্ত হালাল বস্তুও হারাম হয়ে যাবে।(প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. বলেন- [দ্র. আল বাহরুর রায়িক; ১/২৪৩]

جلدة آدمي إذا وقعت في الماء القليل تفسده إذا كانت قدر الظفر

৩. যদি মিশ্রিত বস্তু হারাম হওয়ার কারণ 'নেশা' হয়, তবে দেখতে হবে যে, উক্ত বস্তু কি তরল নাকি শুষ্ক? যদি উক্ত নেশার বস্তুটি তরল না হয় বরং শুষ্ক হয়, তবে কোনো হালাল বস্তুর মধ্যে মিশ্রণের পর যদি তার নেশার প্রভাব দূর হয়ে

গিয়ে থাকে, তবে উক্ত হালাল বস্তু খাওয়াও জায়িয হবে। আর যদি উক্ত নেশার বস্তুটি তরল হয়, তবে দু ধরণের হতে পারে-

১. আঙ্গুর বা খেজুর দ্বারা তৈরিকৃত হারাম চার প্রকার মদের কোনো একটি হলে উক্ত হালাল বস্তুটিও হারাম হয়ে যাবে। চাই মিশ্রণ অল্প পরিমাণে হোক বা বেশি পরিমাণে এবং মিশ্রণের পর তাতে নেশার প্রভাব অবশিষ্ট থাকুক বা না থাকুক।

২. যদি তরল নেশার বস্তুটি আঙ্গুর বা খেজুরের না হয়, তবে শুষ্ক নেশার বস্তুর মতই তার হুকুম হবে অর্থাৎ মিশ্রণের পর যদি নেশার প্রভাব অবশিষ্ট থাকে, তবে হারাম হবে অন্যথায় হালাল হবে।

উল্লিখিত হুকুম থেকে ঐ সকল ঔষধের হুকুমও বের হয়ে আসে, যাতে অ্যালকোহল মেশানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ সকল ঔষধও খাওয়া হালাল হবে, যদি তাতে আঙ্গুর বা খেজুরের মদ থেকে তৈরি অ্যালকোহল না থাকে এবং তার মধ্যে নেশার কোনো প্রভাব না থাকে।

৪. যদি মিশ্রিত বস্তু হারাম হওয়ার কারণ 'ঘৃণিত হওয়া' হয়, তবে দেখতে হবে যে, উক্ত বস্তু মিশ্রিত কোনো খাবারের ব্যাপারে সৃষ্টিগত সুস্থরুচীসম্পন্ন ব্যক্তিদের ঘৃণা সৃষ্টি হয় কি না? অনেক সময় 'ঘৃণাভাব' খবীস জিনিসের সামান্য অংশের মধ্যেও হয়ে থাকে। যেমন কোনো সুস্থ রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি জানতে পারলো যে, বড় এক কলসি পানির মধ্যে একটি তেলাপোকা মরে পানিতে মিশে গেছে! যদিও এখানে খবীস বস্তুর পরিমাণ কম এবং উক্ত খবীস বস্তুর দরুন পানির রং, স্বাদ, ঘ্রাণ কোনোটিই পরিবর্তন হয়নি, তথাপি স্বাভাবিকভাবেই সে উক্ত পানি পান করতে ঘৃণা বোধ করবে। আবার কখনো কখনো খবীস বস্তু কম হলে ঘৃণাভাব হয় না; বরং বেশি হলে হয়। যেমন, বড় এক ডেক বিরিয়ানীর মধ্যে একটি পিঁপড়া পড়ে গেল। খুবই স্বাভাবিক কথা যে, এ খাবার খেতে কেউ ঘৃণা করবে না। কাজেই পারতপক্ষে উক্ত পিঁপড়া দেখা গেলে ফেলে দিতে হবে এবং বাকী বিরিয়ানী খাওয়া জায়িয হবে।

সারকথা, কোনো হালাল খাবারের মধ্যে যদি এত সামান্য পরিমাণ 'খবীস' বস্তু মেলানো হয়, যাতে সুষ্ঠ রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হয় না, তবে তা হারাম হবে না, অন্যথায় হারাম হবে। এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফতোয়াগ্রন্থ ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াতে [৫/৩৩৯] বলা হয়েছে-

دُودُ اللَّحْمِ وَقَعَ فِي مَرَقَةٍ لَا تَنْجُسُ، وَلَا يُؤْكَلُ الدُّودُ، وَكَذَا الْمَرَقَةُ إِذَا انْفَسَخَتْ الدُّودَةُ

এ ব্যাপারে হযরত থানভী রহ. বলেন,

اسی طرح سرکہ کو مع کیڑوں کے کھانا یا کسی معجون وغیرہ کو جس میں کیڑے پڑگیے ہوں مع کیڑوں کے کھانا یا مٹھائی کو مع چیونٹی کے کھانا درست نہیں ہاں کیڑے نکال کر درست ہے

'খবীস' তথা সুস্থরুচিবোধের নিকট ঘৃণিত বস্তু মিশ্রিত মিক্সড ফুডের শরঈ হুকুম

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের উল্লিখিত উদাহরণগুলোতে গভীরভাবে চিন্তা করলে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, 'খবীস' বস্তুর দ্বারা কোনো হালাল খাবার হারাম না হওয়ার ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম যে উদাহরণগুলো উল্লেখ করেছেন, তা মূলত এমন 'অনিচ্ছাকৃত ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা থেকে বেঁচে থাকা সাধারণত কষ্টসাধ্য এবং সে 'খবীস' বস্তুর পরিমাণও যৎসামান্য!' কেননা, এক ডেগ বিরিয়ানী রান্না করতে গিয়ে যদি বাতাশে উড়ে এসে একটি পিঁপড়া ডেগে পড়ে যায়, আর এ কারণে খাবারকে হারাম বলে দেওয়া হয়, তবে নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই মানুষকে এই সাধ্যাতীত দুর্ভোগ থেকে বাঁচানোর জন্য শরী'আতে এ সামান্য পরিমাণের অবকাশ দিয়েছে।

কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো, বর্তমানে বিভিন্ন খাবারে যে খবীস বস্তু মেশানো হয়, তা কোনো অনিচ্ছাকৃত ঘটনা নয় এবং তা থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভবও নয়। কেননা, উদাহরণত প্যাকেটজাত কোনো কোনো খাবারের গায়ে লেখা থাকে, E120 যা মূলত Cochineal [টকটকে লাল রঞ্জক] ও Carminic Acid [এসিড বিশেষ] বুঝায়। আর এ Cochineal ও Carminic Acid তৈরি করা হয় Insect তথা বিশেষ ধরণের একটি পোঁকা থেকে। এ জাতীয় 'খবীস' পোঁকামাকড়

থেকে খাদ্য সংযোজন দ্রব্য উৎপাদন যে এখন একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে, তা বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি মাত্রই জানেন। তাছাড়া Cochineal ব্যবহৃত হয় খাবারের লাল রঞ্জক হিসেবে। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে যে, এ রং খাবারের প্রতিটি অংশেই দৃশ্যমান হয়! কাজেই খবীস জিনিসের পরিমাণ মিক্সড ফুডে নিতান্ত কম হওয়ার যুক্তি এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয়ত, আজকাল মানুষ Carminic Acid যুক্ত খাবার খায়, কারণ সে জানে না যে, এ উপকরণটি Insect থেকে তৈরি করা হয়েছে। যদি সে জানতো যে, তার সামনে পরিবেশিত খাবারে পিঁপড়ে পিষে রং করা হয়েছে, তবে বলাই বাহুল্য যে, যে কোনো সুস্থ রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি তা খেতে ঘৃণাবোধ করবে।

সারকথা, বিরিয়ানী ডেগে অনিচ্ছাকৃত পিঁপড়ে পড়ে যাওয়ার উদাহরণের উপর ভিত্তি করে বর্তমানে 'খবীস' বস্তু মিশ্রণের এই 'খবীস শিল্প' কে জায়িয বলার কোনো অবকাশ নেই। এ কারণেই বর্তমানে মিক্সড ফুডের মধ্যে যদি এ জাতীয় কোনো পোকামাকড় বা অন্য কোনা 'খবীস' দ্রব্য থাকে, তবে তা নিঃসন্দেহে হারাম হবে!

৫. যদি মিশ্রিত বস্তু হারাম হওয়ার কারণ নাপাকী হয়, অর্থাৎ কোনো নাপাক বস্তু কোনো হালাল বস্তুর সাথে মেশানো হয়, যেমন শুকর- যা শরী'আতে সম্পূর্ণরূপে নাপাক। যদি হালাল তরীকায়ও শুকর জবাই করা হয়, তবুও তা পাক হবে না। কাজেই কোনো খাদ্যবস্তুর মধ্যে যদি শুকরের কোনো অংশ মিশ্রিত হয়, তবে তা সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে, যদিও তাতে শূকরের রং, স্বাদ, ঘ্রাণ না থাকে।

উল্লেখ্য, কোনো খাদ্যপণ্যের মধ্যে নাপাক বস্তু - চাই নাপাকী পরিমাণ কম হোক বা বেশি- মিশ্রণ করা যেমন জায়িয নেই, তেমনি নাপাক বস্তু মিশ্রিত খাবার খাওয়াও কারো জন্য বৈধ নয় এবং এ জাতীয় নাপাক বস্তুর মিশ্রণে তৈরি প্রসাধনী ব্যবহার করাও জায়িয নয়। হ্যাঁ, যখন অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কোনো নাপাক বস্তু অল্প পরিমাণে হালাল বস্তুর মধ্যে মিশে যায় এবং এ মিশ্রণ থেকে সাধারণত বেঁচে থাকাও সম্ভব না হয় তবে নাপাক বস্তুর রং, স্বাদ ও ঘ্রাণ উক্ত হালাল বস্তুতে প্রকাশ না পাওয়ার শর্তে নাপাকী ফেলে দিয়ে উক্ত হালাল বস্তু খাওয়া জায়িয হবে। যেমন, ছাগলের দুধ দোহন করার সময় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তাতে ছাগলের দু'একটি লেদা পড়ে যায় এবং তা সাথে সাথে বের করে ফেলা হয়, তবে নাপাকীর রং, স্বাদ, ঘ্রাণ প্রকাশ না পাওয়ার শর্তে উক্ত দুধ খাওয়া বৈধ হবে। কেননা, দুধ দোহনের সময় এ জাতীয় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ঘটনা থেকে বেঁচে থাকা সাধারণত কষ্টসাধ্য!

মৌলিকত্ব পরিবর্তনের পর হারাম বস্তু মিশ্রণের শরঈ হুকুম

হারাম বস্তু মিশ্রণের যে পাঁচটি সূরত উপরে বর্ণিত হয়েছে, এ সকল হুকুম ঐ সময়, যখন মৌলিকত্ব পরিবর্তন ছাড়াই কোনো হারাম বস্তুকে হালাল বস্তুতে মেশানো হয়েছে। এর বিপরীতে যদি [যে কোনো কারণে] হারাম বস্তু যখন রসায়নিক কিংবা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তার মৌলিকত্ব বিলীন হয়ে যাওয়ার পর মেশানো হবে, কিংবা মেশানোর পর তার মৌলিকত্ব বিলীন হয়ে যায়, তখন তার হুকুমও পরিবর্তন হয়ে যাবে। অর্থাৎ তা হালাল হয়ে যাবে।

ফুকাহায়ে কেরাম এর যে প্রকৃষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করেছেন, তা হলো, আঙ্গুর বা খেজুরের শরাব যা নাপাক, কিন্তু এ নাপাক বস্তুটি যখন লবন মেশানোর দরুন সিরকা হয়ে যাবে তখন পাক হয়ে যাবে। তেমনি গাধা লবনের খনীতে পড়ে লবন হয়ে যায়, তখন উক্ত লবন খাওয়াও জায়িয আছে। [সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত দলীলের জন্য পরিশিষ্ট- ৬ দ্র.]

এখন অনুসন্ধানের বিষয় হলো যে, বর্তমানে বাজারে যে সকল প্রসেস ফুড বা মিক্সড ফুড পাওয়া যায়, তাতে যে রসায়নিক পরিবর্তনের পর হারাম বস্তু মেশানো হয়, এখানে উক্ত হারাম বস্তুর মৌলিকত্ব পরিবর্তন হয় কি না? এ বিষয়টি খাদ্য ও রসায়নসংশ্লিষ্ট এক্সপার্টদের মাধ্যমেই অবগত হওয়া সম্ভব। ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও দেশ- বিদেশের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে আমাদের অবগতি হলো যে, প্রকৃতপক্ষে রাসায়নিক পক্রিয়ায় হারাম বস্তুর গুণাগুন পরিবর্তন হয় ঠিক, কিন্তু তার মৌলিকত্ব পরিবর্তন হয় না। কাজেই হারাম বস্তুর মৌলিকত্ব পরিবর্তনের ভিত্তিতে হারাম বস্তু মিশ্রিত মিক্সড ফুডকে এককথায় হালাল বলার কোনো সুযোগ নেই।

ই- কোড সম্পর্কিত শরঈ বিধান

আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী প্যাকেটজাত খাদ্যদ্রবের গায়ে বেশ কিছু বিষয়ের তথ্য প্রদান করা উৎপাদনকারীর জন্য জরুরী। বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য আইন 'লেবেলিং' এর নিয়ম অনুযায়ীও প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্যের মোড়কে খাদ্যপণ্য সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাবলী উল্লেখ করা আবশ্যক। (*লেবেলিং অর্থ লিখিত, মুদ্রিত বা গ্রাফিক্স আকারে বর্ণিত কোনো দ্রব্যের পরিচিতিমূলক বর্ণনা, যাহা লেবেল সন্নিবেশিত বা সংযোজনের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। দ্রষ্টব্য: 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) ৮৭ ধারাতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৯ মে, ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট।*)

তবে অনেক সময় খাদ্য উপাদান বা খাদ্য সংযোজন দ্রব্য বুঝানোর জন্য কোড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমাদের বাজারে প্যাকেটজাত যে সব পণ্য পাওয়া যায়, তার অনেকগুলোর লেবেলে উপাদান অংশতে কিছু ''ই'' কোড [E-CODE] বা নাম্বার দেয়া থাকে। এগুলো আমাদের জন্য আদৌ উপকারী নাকি ক্ষতিকর- ভোক্তাসাধারণ তা জানেন না। *('লেবেল' অর্থ কোনো খাদ্যদ্রব্যের মোড়কের উপর সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এইরূপ কোনো ট্যাগ, ব্রান্ড, মার্ক, চিত্র, চিহ্ন, হলমার্ক, গ্রাফিক্স বা বর্ণনামূলক নির্দেশনা, যাহা লিখিত, মুদ্রিত, সিলমোহরকৃত অথবা স্টেনসিল, এ্যাম্বোশ বা অমোচনীয় কালি দ্বারা কম্পিউটারাইজড প্রিন্টিং এর মাধ্যমে অথবা চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ছাপ প্রদান করা হয় বা সংযোজন করা হয়। (সূত্র : প্রাগুক্ত))*

এই ই- কোডের ব্যপারে বিপরীতমুখী বক্তব্য রয়েছে। যেমন, কারো কারো মতে, 'ই- কোডগুলো শুকরের নির্দেশ করে। অর্থাৎ ই কোড মানে হলো, সংশ্লিষ্ট খাদ্যপণ্যে শুকরের কোনো না কোনো অংশ মিশ্রণ করা হয়েছে। আর শুকর যেহেতু নাপাক, তাই খাদ্যপণ্যটিও নাপাক বিবেচিত হবে এবং তা খাওয়া ভোক্তার জন্য হালাল হবে না!'

মূলত এ বক্তব্যের ভিত্তি এ বিষয়ের উপর যে, ই কোড মানেই হলো 'শুকরের কোনো অংশ'। কিন্তু ''ই- কোড মাত্রই শুকরের নির্দেশ করে কি না?'' এ সমস্যার সমাধানকল্পে আমরা দেশ- বিদেশের বিভিন্ন ফাতাওয়া বিভাগ এবং হালাল ফুড এক্সপার্টদের নিয়ে গঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শরনাপন্ন হই। তাছাড়া আমেরিকা ও বাংলাদেশের কতিপয় ডাক্তারদের লেখনি থেকে আমরা সাহায্য নিয়েছি।

(তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো-
১. বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ- এর ফতোয়া বিভাগ।
২. পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'জামিআতুর রশীদ, করাচী- এর ফতোয়া বিভাগ এবং 'ফিক্বহুল হালাল' বিভাগ। যে বিভাগে হালাল ফুডের উপর আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষণ করে গবেষণা করা হয়ে থাকে।
৩. হালাল খাদ্য ও তার সার্টিফিকেশনের উপর গবেষণাধর্মী পাকিস্তানভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাণ Halal Foundation, Pakistan এবং
৪. হালাল খাদ্য গবেষণা বিষয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাণ ঝঅঘঐঅ SANHA [South African National Halal Authority])

ব্যক্তিগত যথাসাধ্য অনুসন্ধান এবং উল্লিখিত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে ই- কোডের বাস্তবতা সম্পর্কে যে তথ্যাবলী আমাদের সামনে এসেছে, তা আমরা নিম্নে উল্লেখ করছি-

''ই'' কোড মৌলিকভাবে শুকরের নির্দেশ করে না, বরং ই- কোড মূলত European Economic Community (EEC) কর্তৃক স্বীকৃত খাদ্য সংযোজন দ্রব্য বিশেষের (রাসায়নিক বা প্রাকৃতিক খাদ্যের অংশ, রং, স্বাদ, বা রুচি বাড়ানোর উপাদান) নির্দেশিকা। যা নির্দিষ্ট কোড বা নাম্বার দিয়ে আলাদা করা হয়েছে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার প্রাথমিক সময়ে যখন বিভিন্ন ধরণের খাদ্য উপাদান রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এমনভাবে রূপান্তরিত হতো যে, তার উৎস সম্পর্কে ভোক্তার ধারণা লাভ করা সম্ভব হতো না। তখন প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্যের গায়ে সকল খাদ্য উপাদান লেখা আবশ্যক করে দেওয়া হলো। পরবর্তীতে যখন এক দেশের পণ্য অন্য দেশে আমদানী- রপ্তানী হতে লাগলো তখন বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষের সমন্বয়ে আন্তজাতিক বাজার তৈরি হলো। ফলে অঞ্চলভিত্তিক ভাষার বিভিন্নতার দরুন প্যাকেটের গায়ে খাদ্যপণ্যের একটি নির্দিষ্ট নাম সকল অঞ্চলের মানুষের জন্য অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য হয়ে গেলো। এ অবস্থায় ভাষার বিভিন্নতায় খাদ্য সংযোজন দ্রব্য বুঝতে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে খাদ্য সংযোজন দ্রব্যগুলোকে- যা সাধারণত প্যাটেকজাত খাবারের মধ্যে অধিকাংশ সময় ব্যবহার করা হয়ে থাকে- নাম না লিখে ই- কোডের মাধ্যমে প্রকাশ করা হতে লাগলো। কেননা, কোড সব ভাষাভাষি মানুষই বুঝতে সক্ষম ছিলো।

প্রাথমিক পর্যায়ে ই- কোড নির্ধারণ করতো European Economic Community (EEC)। পরবর্তীতে এর দায়িত্ব গ্রহণ করে Codex Alimentarius Commission। কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস অর্থ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা কর্তৃক গঠিত কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস কমিশন কর্তৃক খাদ্য, খাদ্য উৎপাদন ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক নির্ধারিত বা স্বীকৃত মান, ব্যবহার বিধি, নির্দেশনা এবং অন্যান্য সুপারিশ সম্বলিত সমন্বিত খাদ্য কোড।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৫ই মার্চ ২০১৭ তারিখে 'খাদ্য সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা ২০১৭' শিরোনামে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের বর্ণনামতে- বাংলাদেশেও Codex alimentarius Commission- এর 'কোড নীতি' অনুসরণ করা হয়। কাজেই প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্যের গায়ে ই- কোড লেখার বিষয়টি বাংলাদেশেও স্বীকৃত।

ই- কোড মৌলিকভাবে খাদ্য সংযোজন দ্রব্য বুঝায়। এখন জানতে হবে যে, এই খাদ্য সংযোজন দ্রব্যগুলোর 'উৎস' [source] কী? কেননা, সে উৎস হালাল হলে সংশ্লিষ্ট সংযোজিত দ্রব্যও হালাল হবে। আর সে উৎস হারাম হলে সংযোজিত দ্রব্যও হারাম হবে। কাজেই ই- কোডের ভিত্তিতে খাদ্যপণ্যের হালাল ও হারাম নির্ধারণের জন্য ই- কোড নির্দেশিত উপাদানের উৎস সম্পর্কে জানা আবশ্যক!

ই- কোডের শ্রেণীবিভাগ

ই- কোডের খাদ্য উপকরণগুলো তিন ধরণের উৎস থেকে গ্রহণ করা হয়। যথা-

১. প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত

প্রাকৃতিক উৎস যেমন গাছ, লতা- পাতা, শষ্য ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাদানগুলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথক করা হয়, যা পরবর্তীতে উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খাবারে ব্যাবহার করা হয়।

২. রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুতকৃত

প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত 'ই' কোডগুলো অনেক সময় ব্যয়বহুল হওয়ায় পরবর্তীতে কিছু রাসায়নিক উপাদান থেকে গ্রহণ করা হয়।

৩. প্রাণিজ উৎস থেকে প্রাপ্ত

প্রাণিজ উৎস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাদানগুলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথক করা হয়, যা পরবর্তীতে উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খাবারে ব্যবহার করা হয়।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে সকল ই- কোডের উৎস প্রাকৃতিক কোনো উদ্ভিদ কিংবা রাসায়নিক কোনো হালাল পদার্থ, সে ই- কোডগুলো তার উৎসের ভিত্তিতে 'হালাল নির্দেশ করবে, (যদি না তাতে মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর কোনো প্রভাব, নেশা এবং নাপাকী না থাকে)। উদাহরণত E-100। এটা মূলত হলুদ থেকে আহরিত রং বিশেষ। খুবই স্বাভাবিক কথা যে, উদ্ভিজ উপাদান হওয়ায় হলুদের রং কখনোই হারাম হবে না। কাজেই ব্যাপক অর্থে 'সকল ই- কোডই হারামের নির্দেশ করে' এ দাবী বাস্তবতার আলোকে সঠিক নয়।

উৎসের ভিত্তিতে হালাল ও হারামের নির্দেশক হওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত ই- কোডকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি-

১. হালালঃ যে সকল ই- কোড নিশ্চিতভাবে উদ্ভিদ কিংবা রাসায়নিক হালাল বস্তু থেকে আহরিত উপাদানের নির্দেশ করে।

২. হারামঃ যে সকল ই- কোড নিশ্চিতভাবে হারাম প্রাণিজ উৎস থেকে আহরিত উপাদানের নির্দেশ করে।

৩. মাশবূহঃ [যাতে হালাল- হারাম কোনটাই স্পষ্ট নয়] যে সকল ই- কোডের উপদানের উৎসে দ্বিমুখী সম্ভাবনা আছে যে, তা উদ্ভিদ কিংবা রাসায়নিক হালাল বস্তু থেকে আহরিত হতে পারে, আবার প্রাণিজ উৎস থেকেও আহরিত হতে পারে। এই ই- কোডগুলোর ব্যাপারে হারাম হওয়ার সন্দেহ এ জন্য যে, এ সম্ভাবনা আছে যে, সংশ্লিষ্ট ই- কোডের উপাদানটি কোনো হারাম প্রাণি থেকে নেওয়া হয়েছে। অথবা হালাল কোনো প্রাণি থেকে শরঈ জবাই ছাড়াই গ্রহণ করা হয়েছে।

উভয় সূরতেই উক্ত উপাদানটি তার উৎসের কারণে হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু যেহেতু একইসাথে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, উক্ত উপাদানটি উদ্ভিদ উৎস বা রাসায়নিক উৎস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, কাজেই নিশ্চিতভাবে এ ই- কোডগুলোকে হারাম বলা যায় না। বরং বলতে হবে যে, 'এই ই- কোডগুলো হালাল বা হারামের নির্দেশক হওয়ার ক্ষেত্রে অস্পষ্ট। আর খাদ্যপণ্যের মধ্যে যেহেতু শরী'আতের মূল হুকুম হলো হালাল হওয়া, কাজেই সে মূল হুকুমের ভিত্তিতে মাশবূহ ই- কোড যুক্ত খাবার খাওয়া জায়িয হবে। তথাপি যেহেতু অস্পষ্টতা আছে, কাজেই পারতপক্ষে উত্তম হলো এ জাতীয় মাশবূহ ই- কোড থেকেও বেঁচে থাকা। প্রবন্ধের শুরুতে নীতিমালার আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রাণির গোশত ও অ্যালকোহল ব্যতিত অন্য খাদ্যপণ্য মৌলিকভাবে হালাল, যতক্ষণ না তাতে হারাম হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। ই- কোড সম্বলিত প্রসেস ফুড যেহেতু মৌলিকভাবে হালাল, কাজেই মাশবূহ ই- কোড সম্বলিত খাদ্যপণ্যের ব্যাপারেও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

[*ই- কোডের হুকুমের মধ্যে উল্লিখিত "মাশবুহ" শব্দটি কোনো ফিকহী পরিভাষা নয়। বরং এটি নতুন পরিভাষা, যা কুরআন- হাদীসের আলোকে বর্তমান যুগের ফিকহ বিশেষজ্ঞগণ নির্ধারণ করেছেন। এর অর্থ হলো, 'এমন বিষয়, যার হালাল হওয়া কিংবা হারাম হওয়া কোনটাই স্পষ্ট নয় এবং এই অস্পষ্টতা স্থায়ী নয়; বরং গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তা দূরিভূত করা সম্ভব। মাশবূহ- এর অর্থটি বুঝার সুবিধার্থে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি উদাহরণ [তাকরীবী মেছাল] হতে পারে 'মুশকিল' - পরিভাষাটি। আর 'মুশকিল' - এর হুকুম হলো- চিন্তা, গবেষণা এবং তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ অস্পষ্টতা দূরীকরণের চেষ্টা করতে হবে। অস্পষ্টতা দুর হয়ে গেলে স্পষ্ট হুকুম মতে আমল করতে হবে। [উসূলে সারাখসী; ১/১৬৮] সুতরাং 'মাশবূহ' ই- কোডের হুকুমও এমনই। অর্থাৎ গবেষণা এবং তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ অস্পষ্টতা দূরীকরণের চেষ্টা করতে হবে। অস্পষ্টতা দুর হয়ে গেলে সেটাকে হালাল বা হারাম- এর নির্দেশক আখ্যা দেওয়া হবে।*]

এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের উল্লিখিত একটি মাসআলা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করছি।

قال ابن عابدين : في التتارخانية: من شك في إنائه أو في ثوبه أو بدن أصابته نجاسة أو لا فهو طاهر ما لم يستيقن. وكذا الآبار والحياض والجباب الموضوعة في الطرقات ويستقي منها الصغار والكبار والمسلمون والكفار؛ وكذا ما يتخذه أهل الشرك أو الجهلة من المسلمين كالسمن والخبز والأطعمة والثياب اهـ ملخصا.

উল্লিখিত মাসআলার শেষে প্রাণি ব্যতিত সাধারণ খাবার যেমন রুটি ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে যে, যদিও অমুসলিম কিংবা দ্বীনী বিষয়ে অসচেতন কোনো মুসলমান সে খাবার তৈরি করে এবং অমুসলিম হওয়ায় কিংবা অসচেতন মুসলিম হওয়ায় এ সন্দেহ রয়েছে যে, হালাল উপায়ে হয়তো খাবার তৈরি করেনি, তথাপি এ সন্দেহ ধর্তব্য হবে না। বরং তা হালাল মনে করা হবে।

এ বিষয়ে মুফতী রশীদ আহমাদ লুধয়ানভী রহ.- এর একটি ফতোয়া বিশেষভাবে লক্ষণীয়- [দ্র. আহসানুল ফাতাওয়া; ৮/১২৮]

سوال-ڈبل روٹی پر جیلی لگاکر کھاتے ہیں اسکو ناجائز کہتے ہیں-کیونکہ یہ جانور کی کھال اور ہڈی سے بنتی ہے؟آپکی تحقیق کیا ہے؟

جواب-اولا-جیلی کا ہڈی اور کھال سے بنایا جانا ضروری نہیں،درختوں کی و غیرہ سے بھی بنائی جاتی ہے،ثانیا-اگر کھال وغیرہ سے بنائی گئی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ کھال مردار ہی کا ہو،حلال ذبیحہ کی کھال غالب ہے،ثالثا-جیلی کی صنعت میں تبدیل ماہیت کا احتمال بھی ہے اس صورت میں حرام جانور کی کھال سے بنائی ہوئی جیلی بھی حلال ہے،زیادہ تجسس کرنا اور احتمالات و اوہام کی بنا پر احتراز کرنا دین میں تعمق و غلو ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے،اور بلا دلیل شرعی حرمت کا حکم لگانا دین میں زیادتی اور تحریف ہے

সারকথা, উল্লিখিত মাসআলায় 'জেলি' [যা তৎকালিন সময়ে হালাল বস্তু থেকেও বানানো হতো আবার হারাম বস্তু থেকে বানানোরও সম্ভাবনা ছিলো]- এর ব্যাপারে যেহেতু হালাল হওয়ার একটি শক্তিশালী সম্ভাবনা আছে- এর ভিত্তিতে হযরত রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী রহ. উক্ত জেলি হালাল হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন!

ই- কোডের তালিকা

ই- কোডের তালিকা বেশ দীর্ঘ হওয়ায় আমরা সংক্ষিপ্তাকারে কেবল হারাম ই- কোড- এর তালিকা এখানে উল্লেখ করছি।

হারাম ই- কোডগুলো [যা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য] নিম্নরূপ-

E-120, E-441, E-485, E-542, E-630, E-631, E-632, E-633, E-634, E-635, E-640, E-904, E-920, E-921, E-1510, E-1519

বি.দ্র. উল্লিখিত হারাম ই- কোডগুলোর মধ্য হতে কিছু ই- কোডের ব্যাপারে উৎসের ক্ষেত্রে নিজ নিজ গবেষণা অনুযায়ী কেউ কেউ 'মাশবূহ' এর ব্যাক্ত করেছেন। তবে সতর্কতামূলক আমরা হারাম হওয়ার মতটিকেই গ্রহণ করেছি।

ই- কোডের উল্লিখিত হুকুমের সমর্থনে বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়াটি লক্ষণীয়-

سوال-یہ سوال پہلے پوچھے گے ایک سوال کے تعلق سے ہےکہ آیا انڈیاکی کھانے کی مصنوعات جن پر ای کوڈ ہوتا ہے اس میں سور کی چربی شامل ہوتی ہے؟یہ بہت تشویشناک معاملات ہےدار العلوم دیوبند اس معاملہ میں کیوں خاموش ہے؟ مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ مجھے اطمینان بخش جواب ملیگا

جواب-فقہ کا ضابطہ ہے کہ "الاصل فی الاشیاء الاباحہ"چیزوں کے اندر اباحت ہے جبتک ہمیں پوری پختگی کے ساتھ یہ معلوم نہ ہو جاے کہ حرمت کاکونسا پہلو اس میں موجود ہے تب تک کوئ ہتمی راے ہم قائم نہیں کر سکتے۔اور محض شک کی وجہ سے کسی چیز کو حرام کہ دینا شریعت کے اصول کے خلاف ہے آپ اپنی ذاتی حد تک احتیاط برت سکتے ہیں- فتوي نمبر/١٧٤٦=٢١٣٩ :ب)

ই- কোডের উল্লিখিত হুকুমের সমর্থনে পাকিস্তানের বিখ্যাত দ্বীনী বিদ্যাপীঠ জামিআতুর রশীদ করাচী'র ফতোয়াটি লক্ষণীয়-

سوال-کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کھانے پینے کی اشیاء جو ای کوڈکے نام سے استعمال ہوتی ہےاور کہا جاتا ہے کہ اس میں خنزیر کی چربی استعمال ہوتی ہےبندہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے؟

جواب-ای کوڈ اشیاء میں شامل غذائ اجزاء اور غذائ اضافات ()کی علامت ہے-یہ غذائ اجزاء اور غذائ اضافات نباتات اور جانوروں سے حاصل کیے جاتے ہیں- اگر یہ نباتات سے ماخوذ ہو تو شرط یہ ہے کہ یہ مضر اور نشہ آور نہ ہوں-اور اگر جانوروں سے حاصل کردہ ہو تو شرط یہ ہے کہ جانور حلال ہو نیز انہیں شرعی طریقہ سے ذبح کیاگیا ہو -

اگر کسی مصنوع میں شرائط مذکورہ کے حامل غذائ اجزاء اور غذائ اضافات کے ای کوڈز شامل ہو تو وہ ای کوڈز حلال ہوگیورنہ حرام شمار ہوگی -

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئ کہ ہر ای کوڈ مصنوع کے حرام ہونے پر دلالت نہیں کرتا،بلکہ اس کے بارے میں تفصیل مذکورکے مطابق معلوم کیا جائیگا کہ وہ ای کوڈکس غذائ جزوکی علامت ہے اور وہ غذائ جزو حلال ہے یا حرام؟-جامعة الرشيد, كراتشي, باكستان-فتوي نمبر(٦٥٣٥٨/٥٨ :

ই- কোডের উল্লিখিত হুকুমের সমর্থনে একই মত ব্যক্ত করেছেন হালাল খাদ্য গবেষণা বিষয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাণ SANHA [South African National Halal Authority - এবং পাকিস্তানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Halal Foundation, Pakistan. *[তাদের সিদ্ধান্তের কপিগুলো আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে।]*

সাধারণ ভোক্তাদের করণীয়

আলোচ্য প্রবন্ধ পাঠের পর একজন সচেতন পাঠক মাত্রই এ বিষয়ে দ্বিধান্বিত হবেন যে, হালাল খাদ্য ও ই- কোডের ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট করণীয় কী? এ পর্যায়ে করণীয় সম্পর্কে নিবেদন হলো-

১. যদি খাদ্যপণ্য হালাল ই- কোড সম্বলিত হয়, তবে খাদ্যপণ্যকে হালাল মনে করতে হবে এবং নির্দ্বিধায় তা ক্রয় করা এবং খাওয়া যাবে।

২. যদি হারাম ই- কোড সম্বলিত হয়, তবে খাদ্যপণ্য ক্রয় করা কিংবা খাওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকতে হবে।

৩. যদি মাশবূহ ই- কোড সম্মলিত হয়, তবে খাদ্যপণ্যকে মৌলিকভাবে হারাম তো বলা যাবে না; তবে তাকওয়া ও পরহেজগারীর দাবী হলো সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বেঁচে থাকা। কাজেই পারতপক্ষে মাশবূহ ই- কোড সম্বলিত খাদ্যপণ্য থেকে বেঁচে থাকাও উত্তম বিবেচিত হবে।

এতদ্বসত্ত্বেও কেউ যদি তা ক্রয় করে কিংবা খায়, তবে তা ক্রয় করা এবং খাওয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া না যায়।

দেশীয় পণ্যের গায়ে 'হালাল' ট্যাগ: আস্থা রাখা যাবে কি?

আমাদের দেশে উৎপাদিত কোনো কোনো দেশীয় পণ্যের গায়ে আরবীতে, ইংরেজিতে এবং বাংলায় 'হালাল' শব্দটি লেখা থাকে। কিন্তু এই হালাল সার্টিফিকেশনের ধর্তব্যের বিষয়টি চিন্তার দাবী রাখে। কেননা, এ সার্টিফিকেট যদি উৎপাদকের পক্ষ হতে লাগানো হয়ে থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে সবধরণের এক্সপার্টদের নিয়ে গঠিত 'হালাল সার্টিফিকেশন বোর্ড থাকতে হবে। নতুবা হালাল- হারাম নির্ধারণে ভুল হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। খাদ্য উৎপাদক কোনো দেশীয় কোম্পানীতে এমন বোর্ড আছে বলে- আমাদের জানা নেই। দ্বিতীয়ত, এ হালাল লেখাটি যদি দেশের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে হয়, তবে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সরকারীভাবে আমাদের দেশে খাদ্যপণ্যের উপাদান হালাল উৎস থেকে আহরিত হওয়া কোনো আবশ্যক নয়। এ কারণে খাদ্যপণ্যে উৎস হালাল হওয়ার ব্যাপারে উৎপাদকগণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যদ্দরুণ সকল এক্সপার্টদের নিয়ে গঠিত নির্ভরযোগ্য ও স্বয়ংস্পূর্ণ কোনো হালাল সার্টিফিকেশন প্রতিষ্ঠান নেই। এ বিষয়ে ১০ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ শিরোনামে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটে নিরাপদ খাদ্য আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে এভাবে-

"বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ"।

অর্থাৎ নিরাপদ খাদ্য দ্বারা উদ্দেশ্য 'বিজ্ঞানসম্মত খাদ্য'। এখানে 'শরী'আতসম্মত' কোনো বিষয় লক্ষণীয় নয়। এ বিষয়ে উক্ত গেজেটে 'বিজ্ঞানসম্মত খাদ্য নয়' তথা ভেজাল খাদ্য- এর ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত ২৯ নং ধারাটি সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। যে ধারার সারমর্ম হলো-

ভেজাল খাদ্য বা বিজ্ঞানসম্মত নয়- এমন খাদ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'মানবস্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য'। শরী'আতে কোনো খাদ্যপণ্য হারাম হওয়ার যে পাঁচটি কারণ রয়েছে, তার সবগুলো এখানে লক্ষণীয় নয়।

বিদেশী পণ্যের গায়ে 'হালাল' ট্যাগ

তবে হ্যাঁ, উল্লিখিত 'হালাল' ট্যাগ সম্বলিত পণ্যটি যদি দেশীয় না হয়, বরং বিদেশ থেকে আমাদানীকৃত হয়, তবে উক্ত হালাল ট্যাগটি যদি হালাল খাদ্য বিষয়ক এক্সপার্টদের সমন্বয়ে গঠিত কোনো নির্ভরযোগ্য বোর্ডের মাধ্যমে স্বীকৃত হয়, তবে উক্ত পণ্য খাওয়া জায়িয হবে, অন্যথায় উক্ত পণ্যের হালাল ও হারামের ব্যাপারে অনুসন্ধান আবশ্যক।

والله أعلم وعلمه أتم وأحكم